ছেলে-ধরা

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

সবাই মিলে বাসায় ফিরে এলাম।

এসেই দেখি ঝুমরির মা বাংলোর বারান্দাতে বসে। তার সঙ্গে নাহানপুর গ্রামের কয়েকটি লোক। নাহানপুর শোন নদের ধারে একটা গ্রাম—বেশির ভাগ গোয়ালার বাস এ গ্রামে। শোনের চরে গরু মহিষ চরিয়ে দুধ ঘি উৎপাদন করে। ডিহিরি থেকে ঘি চালান যায়। এই নাহানপুর গ্রাম থেকেই তিনটি ছেলে হারিয়েছে গত পনেরো দিনের মধ্যে। ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি যে হয়েছে এই বন্য গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে, সেটাকে নিতান্ত অকারণ বলি কি করে !

একটা লোক এগিয়ে এসে বললে—কি হল বাবু ?

আমরা বললাম—কিছু না, তোমরাও তো খুঁজছিলে !

—হাঁ বাবুজি। আমাদেরও কিছু না।

তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ?

—বহুৎ দূর, বন-জঙ্গলের দিকে। সে-সব দিকে তোমরা যেতে পারবে না। তোমরা চেনো না সেদিক।—পরে ওরা পরামর্শ করতে বসল। আমরা বাঙালি বাবু, লেখাপড়া-জানা, আমরা কি দিই পরামর্শ ওদের ?পনেরো দিনের মধ্যে তিনটি ছেলে উধাও ! এখানে বাস করা দায় হয়ে উঠল। ডিহিরি শহর এখান থেকে অনেক দূর, প্রায় ন মাইল রাস্তা। সেখানে গিয়ে পুলিশের সাহায্য চাওয়া কি উচিত নয় ?

আগের লোকটার নাম মন্নু আহীর। মন্নু বললে ওই অঞ্চলের হিন্দিতে—বাবু, জঙ্গল-পাহাড় অঞ্চলের গাঁ। বেশি লোক থাকে না এক গাঁয়ে। দূরে দূরে গাঁ। এখানে এই রকম বিপদ হলে আমরা কি করে বাঁচি ?আপনারা এসেছেন বেড়াতে, মজুমদার সাহেবের কুঠিতে আছেন, তবু কত ভরসা আমাদের। মজুমদার সাহেব বড়লোক, আসেন না আজকাল আর। আগে আগে যখন নতুন কুঠি বানালেন, তখন কত আসতেন।

ওরা সেদিন চলে গেল যখন, রাত দশটা। বেশ দল বেঁধে মশাল জ্বেলে চলে গেল।

সতীশ গিরির দলপতিত্বে পরদিন হৈ-হৈ করে হারানো ছেলে খুঁজতে বেরনো গেল। রোটাস গড়ে ওঠাই হত এবং ঠিক ছিল। কিন্তু একজন মহিষ-চরানো বৃদ্ধ রাখাল আমাদের বারণ করলে। ওখানে কি করতে যাবে বাবুজী, রোটাস গড়ে লোক থাকে না। চৌকিদার একজন আছে, সে সব সময় ওপরে থাকে না, নিচে নেমে আসে। ওখানে যাওয়া মিথ্যে।

বনের মধ্যে একস্থানে আমরা সেদিন বাঘের থাবার দাগ পেলাম। মহুয়া গাছের তলায় দিব্যি বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ। আমাদের মধ্যে একজন বললে—ওদের বাঘে নিচ্ছে না তো ?যে বাঘের ভয় এদেশে—

হীরু বললে—তাই বা কি করে সম্ভব ?বাঘ গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলে সেখানে তো পায়ের দাগ থাকত।

দুপুরে আমরা খেতে এলাম বাসায়। শোনের চরে বালুহাঁস শিকার করেছিল ধীরেন আজ সকালে, আমাদের বেরোবার আগে। দশ মিনিটের মধ্যে তিনটি। খুব মজা করে হাঁসের মাংস খাওয়া যাবে সবাই মিলে।

সতীশ গিরি খাওয়ার সময়ে বললে—শিকার করা বর্বরের কাজ তা জানো ?

আমরা সবাই চুপ।

হীরু বললে—বাজার থেকে মাংস কিনে খাওনি কখনো ?

সতীশ গিরি বললে—আমি দেখে-শুনে তো সে জন্তুকে মারিনি। আমি না কিনলেও অপরে কিনত।

খাওয়া-দাওয়ার পরে হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল। জন-কয়েক লোক এসে হাজির হল বাংলোর কম্পাউন্ডে ব্যস্তসমস্তভাবে। সতীশ গিরি এগিয়ে গিয়ে বললে—কি হয়েছে ?কি, কি ?

ওরা বললে—আবার ছেলে চুরি গিয়েছে আজ।

আমরা সবাই অবাক। সতীশ বললে—আজ ?কোন্ গাঁ থেকে ?

—নাহানপুর থেকে দুমাইল ওদিকে। উনাও বলে একটা গাঁ। একটা ছোট ছেলে নিয়ে মা ফিরছিল গাঁয়ের বাইরের মাঠ থেকে। ছোট ছেলেটাকে এক জায়গায় ওর মা রাস্তার পাশে রেখে শালপাতা ভাঙতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে ছেলে নেই।

—বাঘের পায়ের দাগ ?

—না বাবু ?

—মানুষের ?

—অত ভালো করে মেয়েমানুষ কি দেখেছে ?

আমরা বাংলো থেকে সন্ধের আগেই বেরিয়েছি। কত জায়গায় খুঁজলাম কিন্তু কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না খোকার। সেই বনবেষ্টিত পাহাড়-অঞ্চলে সন্ধ্যার পর বেরনো কত বিপজ্জনক আমরা জানি, কিন্তু তবু ছেলেটিকে খুঁজে এনে মায়ের কোলে দেওয়ার আনন্দ যে কত বড় ! যদি পারা যায়, যদি খোকার মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারি !

কিন্তু এদিকে রাত হয়ে আসছে। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হীরু। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, জঙ্গলাবৃত পাহাড় চারিধারে। বাঘের ভয়ও আছে। বৈশাখ মাসের চড়া রোদে পাহাড় তেতে এমন আগুন হয়ে আছে যে একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয় না। তাও সত্যিকার ঠাণ্ডা হয় না। বিদেশে বেড়াতে এসে কি শেষে বাঘের পেটে যাব ?

কথাটা ঠিক।

সতীশ মহারাজের কি ! তার বাপ নেই, মা নেই। মরে গেলে কাঁদবে না কেউ। আমাদের তা নয়, আমাদের সবাই বেঁচে।

হীরু বললে—আজ কদিন হল আমরা এসেছি এখানে ?

আমি বলি হিসেব করে—আজ তেরো দিন।

—আর কতদিন থাকা হবে ?

—আর চার পাঁচ দিন।

—কিন্তু এই হাঙ্গামাটা না চুকলে তো—

—সে তো বটেই।

হীরু বললে—ঘরের পয়সা খরচ করে বেড়াতে এসে কি ফ্যাসাদ !

ধীরেন একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে—কে জানত এমনতর হবে ?তাহলে কি—

সতীশ আমাদের মধ্যে সাধু-প্রকৃতির লোক। অনেস্ট, সত্যবাদী, পরোপকারী—ওকে আমরা এইজন্যে সতীশ গিরি, কখনো সতীশ মহারাজ বলে ডাকতাম, অবিশ্যি ব্যঙ্গচ্ছলে।

সতীশ মহারাজ বললে—ওর মায়ের কান্না শোনবার পরেও একথা তোমরা বলতে পারলে ?

ও মাঝে মাঝে আমাদের বিবেক জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা পায় এইভাবে। সেদিন এক বুড়ি টোমাটো নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে ডেকে বললাম—এসো, টোমাটো কিনব। বুড়ি বাজার-দর জানে না বোধ হয়। সে বললে—বাজারে তোমরা কত করে কেন বাবুজি ?

আমরা জানি ছ পয়সা বাজার-দর একসের টোমাটোর। হীরু বললে—চার পয়সা দর বাজারে, দিবি ?

বুড়ি দিয়ে গেল।

কিন্তু সতীশ গিরির তিরস্কারে সে টোমাটো আমাদের মুখে ওঠেনি সেদিন।

হীরুর নির্বুদ্ধিতা, সে গেল বাহাদুরি করতে তা নিয়ে খাবার সময় !

আমরা সবাই খেতে বসেছি। সতীশ মহারাজ গম্ভীরভাবে হেঁকে বললে—'টোমাটোর অম্বল আমার পাতে দিয়ো না।' সবাই অপ্রস্তুত। যে রকম সুরে সে হেঁকে বললে, তার পর সেদিন আর উক্ত তরকারি কারো পাতে পড়তে পারল না। অসম্ভব। যাক গে, আজ কিন্তু সতীশ মহারাজের কথার প্রতিবাদ করলে ধীরেন। বললে—কুমারির মা দোর খুলে শুয়েছিল কেন রাত্তিরে ?

সতীশ বললে—তাই কি ?

—তা না হলে তো ছেলে হারাত না !

—সে নির্বোধ মেয়েমানুষ।

—তাহলে তার এমন হওয়াই উচিত। যখন সবাই জানে একথা যে, গাঁ থেকে বা এ অঞ্চল থেকে ছেলে চুরি যাচ্ছে প্রায়ই—

হীরু বললে—এইবার নিয়ে চারটি ছেলে এভাবে গেল।

ধীরেন বললে—হ্যাঁ, যখন তা সবাই জানে তখন কি ওর উচিত হয়েছে রাতে দোর খুলে শোওয়া ?

সতীশ বললে—এ গরমে করেই বা কি ?

—তখন তার যাওয়াই উচিত। আমাদের দোষে তো যায়নি ?

আমি ওদের থামিয়ে বলি—শোন, বাজে বকে লাভ নেই। ছেলে চুরি বা হারানো এ অঞ্চলে আমরা এসে পর্যন্ত শুনছি একথা ঠিক। তবু এসব দেশের গ্রাম্য লোকে অত সতর্ক হতে শেখেনি। পরের ছেলে হারিয়েছে—খোঁজবার চেষ্টা করা যাক, বিশেষ করে ওর মা আমাদেরই ঝি। যে কদিন আমাদের ছুটি বাকি আছে খোঁজ, না পাই কলকাতায় যাবার সময় মনে অন্তত আমাদের ক্ষোভ থাকবে না। এ অজানা বন-জঙ্গলের দেশে আমরা এর বেশি আর কি—

আমাকে সবাই সমর্থন করলে।

সতীশ বললে—কাল চল রোটাস ফোর্টে উঠে দেখা যাক।

ধীরেন বললে—বড্ড সোজা কথা বললে। রোটাস ফোর্টে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। এ গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ওপরে জল নেই। বাঘ সেদিনও বেরিয়েছিল জঙ্গলে। ফেরবার পথে সন্ধে হয়ে গেলে ঐ বন ভেঙে নিচে নামতে পারব ?আমাদের ঘরে বাপ-মা আছে সতীশদা !

আমি বললাম—তা ছাড়া রোটাস ফোর্টে পাহাড়ের ওপর ছেলে নিয়ে গিয়ে তুলবে কে ?আমার মনে তো হয় না !

সতীশ বললে—দেখতে দোষ কি ?

—তুমি বলো যদি, আমি তোমার সঙ্গে যাব সতীশ। তুমি ভাবতে পারো এরা কষ্টের ভয়ে হয়তো যেতে চাইবে না। চল কাল সকালে।

হীরু ও ধীরেন নিজেদের ছোট করতে চায় না। তারা মুখে বললে, আমরাও যাব—কিন্তু মনে মনে বোধ হয় বিরক্ত হল আমার ও সতীশ মহারাজের ওপর।

গ্রামের লোকজন ডাকিয়ে আমরা তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিয়ে এক এক দিকে পাঠালাম। আমরা নিজেরাও বেরিয়ে পড়লাম। নাহানপুরের পথে, ডিহিরি যাবার পথে, শোন নদের ধারে—সব দিকে আমরা বলে দিয়েছি কোনোরকম সন্ধান পেলে যেন বাংলোতে এসে খবর দেওয়া হয়। সেখানে সতীশ মহারাজ স্বয়ং বসে। তাকে কোথাও যেতে দিইনি আমরা। কারো মুখে কোনোরকম সন্ধান পেলে যেন বাংলোয় খবর দেওয়া হয়।

সারাদিন কেটে গেল। কেউ কোনো খবর নিয়ে এল না। কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না হারানো ছেলের। সন্ধ্যার অনেক পরে আমরা পরিশ্রান্ত দেহে বাংলোর বারান্দায় পা দিতে না দিতে সতীশ গিরির দুর্বার জেরা।...কাজে ফাঁকি আমরা দিয়েছি কিনা দেখে নেবে সতীশ। আমরা কি ওখানে গিয়েছিলাম ?সেখানে গিয়েছিলাম ?অমুক জঙ্গলের পথ কি দেখেছি ?একটু চা খাব সারাদিন পরিশ্রমের পরে, তা কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই প্রাণান্ত হবার উপক্রম হল।

খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়া গেল। কাল সকালেই আবার নাকি বেরোতে হবে। ধীরেন বললে—চল, পরশু আমরা এখানথেকে খসে পড়ি। আর এ ঝঞ্ঝাট ভালো লাগে না।

আরো দুদিন কেটে গেল। কোনো ছেলেরই পাত্তা পাওয়া গেল না। ঝুমরির মা কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, গ্রামের লোকজন এসে ফিরে যায়। আমরা কদিন খোঁজাখুঁজির পর ক্রমে আলগা দিলাম। ক্রমে আরো দিন কেটে গেল।

সেদিন আমরা জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে রওনা হয়ে পড়লাম। সিমেন্ট পাহাড়ের গা কেটে পাথর নিয়ে যাচ্ছে ডিহিরিতে, সেই লরিতে আমরা চলেছি। জিনিসপত্র সমেত আমাদের ডিহিরি স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার ভাড়া সাত টাকা ধার্য হয়েছে।

লরি ছাড়ল রাত আটটার সময়। পাথর বোঝাই করতে দেরি হয়ে গেল। পাহাড়-জঙ্গলের পথে বোঝাই লরি বেশি জোরে যেতে পারছে না, আমরা দিন কুড়ি পরে কলকাতায় ফিরছি, মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলেছি।

ডিনহা ও বোচাহির পাহাড়ের কাছাকাছি পার্বত্য ক্ষুদ্র নদী পার হতে পাথর-বোঝাই লরির খানিকটা সময় লাগল। হাঁটুখানেক জল নদীতে। ঘন জঙ্গল দুধারে—হরীতকী, মহুয়া ও শাল। কি একটা পাখি কুস্বরে ডাকছে ডিমহা পাহাড়ের ওপরকার বনে। লরি হু হু চলেছে।

এমন সময় লরিওয়ালা বলে উঠল—ও ক্যা বাবুজী ?

আমরা লরিড্রাইভারের পাশেই বসে। তখন দশটা, কোনোদিকে লোকালয় নেই সেখানটাতে। চেয়ে দেখি, পথ থেকে রশি-দুই ধরে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। যেন কেউ আগুন পোয়াচ্ছে কি ভাত রেঁধে খাচ্ছে। আমরাও চেয়ে দেখলাম।...কে ওখানে ?

কৌতূহল হল দেখবার জন্যে। লরি থামিয়ে রাস্তার একপাশে রাখা হল। আমি ও সতীশ গিরি এগিয়ে গেলাম। আমাদের পেছনে পেছনে ধীরেন, হীরু ও লরি-ড্রাইভার। যখন আধ রশি মাত্র দূরে আছে আগুন তখন আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম হঠাৎ।

অন্ধকার রাত। শোন নদের ধারের কাশচর দূর থেকে সাদা কাপড় পরা প্রেতের মতো দেখাচ্ছে। ধীরেন বললে—শোনের ধারে যাস নে ভাই, ওদিকেই কাশবনে বাঘ থাকে। চল সিমেন্টের পাহাড়ের ওপর। সতীশ মহারাজ গম্ভীরভাবে বললে—ওটা সিমেন্টের পাহাড় নয়। সিমেন্ট জিনিসটা বালির সঙ্গে আরো জিনিস মিশিয়ে তৈরি করতে হয়। ওটা বেলে পাথরের পাহাড়, যাকে বলে স্যান্ডস্টোন।...আমাদের মনের অবস্থা এখন সতীশ গিরির ভূতত্ত্ব-বক্তৃতা শোনবার অনুকূল নয়। আমরা আজ আর খুঁজতে রাজী নই। আর খুঁজবই বা কোথায় ?

বড় সিমেন্টের পাহাড়ের তলায় শালচারা আর কি কি গাছের বনজঙ্গল। সেদিন সন্ধ্যায় এখানে হায়েনার হাসি শোনা গিয়েছিল। সে হাসি গভীর রাত্রে শুনলে প্রেতের অট্টহাসির মতো শোনায়; শহুরে ছেলে আমরা,

আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। পাহাড়ের ওপর কলকাতার কোন্ ভদ্রলোকের এক বাংলো আছে। কিন্তু তিনি কোনোদিন আসেন না। তাঁর বাড়ির দরজা-জানলায় উই ধরেছে, কাঠের ফটকটা ভেঙে দুলছে কব্জার গায়ে। ভূতের বাড়ি বলে মনে হয় প্রথমটা। লোকে বলে ভূতও নাকি আছে। মহুয়া ফুলের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, বড় বড় মহুয়া গাছগুলোর তলায় পাতা পুড়িয়ে দিয়েছিল গত চৈত্র মাসে মহুয়া ফুল সংগ্রহ করবার জন্যে। পাতা-পোড়া ছাইয়ের গন্ধ বাতাসে। ছাইয়ের ওপর আবার পড়েছে শুকনো পাতার রাশ। খস খস করে কি একটা জন্তু পালিয়ে গেল তার ওপর দিয়ে।

ধীরেন চমকে উঠে বলল—ও কি রে ?

আমি বললাম—কিচ্ছু না ! শেয়াল হবে।

আমাদের চোখে যা পড়ল তা এই—

একটা বড় অগ্নিকুণ্ডের সামনে একজন লোক বসে কি করছে। দূর থেকেই মনে হল লোকটা দীর্ঘাকার—একটু অসম্ভব ধরনের দীর্ঘাকার। কি একটা নাড়ছে-চাড়ছে আগুনের সামনে বসে যেন।

সতীশ গিরি বললে—সন্নিসি ?

আমাদের মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই সন্নিসি-টন্নিসি হবে। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে এই গভীর রাত্রে—আচ্ছা সন্নিসি তো ! বাঘের ভয়ে দিনমানে এখানে মানুষ আসতে ভয় পায় যে !

আমরা এগিয়ে গেলাম আরো। লোকটাও বেজায় লম্বা—অগ্নিকুণ্ডের ধারে উবু হয়ে বসে লোকটা কি একটা আগুনের ওপর ধরে নাড়ছে-চাড়ছে। বেশ বড় ও কালো মত একটা কি। কি ওটা ?আলো-আঁধারে সে জিনিসটা দেখাচ্ছে যেন একটা কালোকাপড়ের বান্ডিলের মতো। আমাদের সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে। কি জিনিস ওটা ?

হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। সেই কালো বান্ডিলের মতো জিনিসটা থেকে যেন একটা ছোট হাত ঝুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সতীশ মহারাজ ও ধীরেন একসঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁরে, ও তো একটা ছোট ছেলে !

আমরা তখন ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। অদূরে সেই অতি দীর্ঘাকার বিকটদর্শন লোকটাকে রাক্ষসের মতো দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসীর সাজ বটে। দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক ওর কপালে, দীর্ঘ জটাজুট, এতখানি লম্বা দাড়ি পড়েছে বুকের ওপর।

লোকটা সামনের অগ্নিকুণ্ডের ওপর একটা ছোট ছেলেকে দুহাতে ধরে ঝলসাপোড়া করছে। বাতাসে মরাপোড়ার বিকট দুর্গন্ধ।

আমরা কেউ এগোতে সাহস করলাম না। কারো মুখে কথাটি নেই। এই গভীর রাত্রি, নির্জন পাহাড়-জঙ্গল, কোথাও লোকালয় নেই কাছে। সম্মুখে এই নর-রাক্ষস। কেমন একপ্রকার আতঙ্কে আমরা সবাই মোহগ্রস্ত হয়ে চুপ করে আছি, এক পাও কেউ এগোয় না।

লোকটা আমাদের দেখলে কট্‌মট্ চোখে। তার পর যেন বিরক্তমুখে সেই আধ-ঝলসানো ভঙ্গিতে। তারপর ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে অন্ধকারে বনের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সতীশ গিরির মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে গেল একটা কথা—ছেলে-ধরা !